*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 28-42*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8**

# উৎপলকুমার বসুর কবিতা : সৃজনধর্মীতা

**শিবশঙ্কর পাল**
*গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ., ভারত*

***Abstract :***

*Utpalkumar Basu was the Bengali poet of fifties. A poet with multi dimensional features. By his writing he created a unique tone of poetry. Where style of prose, process of story telling, audio and visual effect meets in his poetry. Not only that the sequence of word, structure of sentence, use of signs make us thoughtful. His thought, his creation can enhance Bengali poetry for many decades. He also presents the visualised event, activity of life, present and past features of social ongoing. This poet is ambulant too, he likes to travel and fetch the element of poetry from the way of walk. His poetry travels from the past era to the present time. Where he keeps the reality of life, thinking process of mind, happenings of society, struggle of middle class family etc. This travel of poet reveals many space of creativity, form and frame of poetry. In a single poem, Mr Basu can Place unique imagination, knowledge, scenario, new way of talks. That can encourage every single reader to rethink about the soul of poetry, its bonding process and psychological effect. From where a poem can rebirth, can message towards the life. Somewhere unused materials of household use, take part in his writing and tries to utter Basu's humanists touch with them. His writing can voice with all-round effect of literature. Can change the style of poetry with new vision. This type of poetry can create a new zone with craftsmanship, mixing multiple content with integrated medium of talks, can travel indoor to outdoor with observation and their placement in sentence. Mr. Basu had created new foundation of sentence, new formation of visualization, travelling events, and placed unused material in poetry with inner meaning with them. A reader can take a lesson from his poetry, can enhance their thinking ability. Thus Utpalkumar Basu gives us freedom to relook his poetry in a different way.*

***Key Words: Structure, Travelling, Time Zone, Creativity, Middleclass Family, Houshold Materials***.

পঞ্চাশের কবি উৎপলকুমার বসু। শক্তি সুনীলদের সমকালে উৎপলের কবিতার আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শব্দকে সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা, বিভিন্ন বিষয়কে একসাথে একই বাক্য স্থান দেওয়া, কবিতাকে গদ্য গল্প ও নাটকের মোড়কে তুলে ধরা —এসব নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য ‘পুরী সিরিজ’ বাংলা কবিতায় একটা নতুন ধারার সূচনা করেছিল। কবিতায় চকিতে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, স্মৃতি চেতনা বিজ্ঞান অতীত বর্তমানকে নিয়ে লাগাতার কথা বলে যাওয়া উৎপলের নিজস্ব বৈশিষ্ঠ। তাঁর ‘পুরী সিরিজ’ থেকে ‘হাঁস চলার পথ’ কাব্যগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের একত্র মিশ্রণ তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। শক্তির বলিষ্ঠ

উচ্চারণ, সুনীলের শব্দের প্রেমাবেশ অপেক্ষা উৎপলের কবিতা, কবিতার বাক্যগঠন, বাকরীতি, কবিতাকে দৃশ্য শ্রাব্য করে তোলা, ছবির পর ছবি তুলে ধরে কবিতাকে সচল করে তোলা—এসব নিয়ে উৎপল পাঁচের দশকের এক ভিন্ন কবিকণ্ঠ। উৎপলকুমার বসুর কবিতা যেমন বহু স্তরবিশিষ্ঠ তেমনই বহুকৌণিক। বিভিন্ন মাধ্যমের (MEDIA) অবস্থান সেখানে। কখনও তা চিত্রশিল্পীর মতো রেখার আঁচড়ে অঙ্কিত- ' চির্ত্রাপিত, শুধু রঙ –নয় কোন কথা'। কখনও লোকমুখের ভাষা অডিওর মতো এসে হাজির হয়। চিত্রকল্পের হাত ধরে কখনও চলে আসে ছবি, চোখে দেখা সমুদ্র থেকে প্রান্তিক অঞ্চল আবার কখনও স্মৃতি থেকে ভেসে আসে পুরাণ প্রসঙ্গ। নাট্যদৃশ্যের মত হাজির হয় নানান চরিত্র। প্রচলিত বা হারাতে বসা গানের কলি এসে দোলা দিয়ে যায়, আবার কখনও লোকমুখের কথকতাকে একনাগাড়ে প্রলাপের মত বলে যান। সব কিছু নিয়ে তাঁর কবিতা, যেন মিশ্র মাধ্যমের ( MIXED MEDIA) সমাবেশ। এ এক নতুন ধরনের কবিতার আঙ্গিক, যা উৎপলের স্ব-মস্তিষ্ক প্রসূত। আবার কারুশিল্পের (CRAFR) প্রতি আগ্রহের কারণে তাঁর কবিতা কখনও কখনও কোলাজের মত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এমন এক ছবি তুলে ধরে, যার আস্বাদ টুকরো টুকরো করে পাওয়া যায় না-যার আস্বাদ নিহিত থাকে কবিতার সামগ্রিক গঠনের উপর। বিভিন্ন মাধ্যমকে একত্রিত করে, কবিতার প্রচলিত ধারাকে পিছনে ফেলে রেখে, সাহিত্য বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বের রংবেরং এর লীলাখেলা উৎপলের কবিতা। রাস্তাঘাটে দেখা ঘটনাকে যেমন তিনি কবিতায় নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে জারিত করে দেন আত্ম-জিজ্ঞাসার বাক্য, 'হুল সাংবাদিকতা'র মতো তুলে ধরেন নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে, আবার অতীত ও বর্তমানে সমরূপে সম্প্রসারণশীল হয়ে তাঁর কবিতা, পথ চলে —কবিতার ভবিষ্য নির্দেশ করে। এ এক সদাভ্রাম্যমাণ পথিকের জগত দর্শন, চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত বা গূঢ় উপদেশ বাক্যকে বহু দূরে ফেলে রেখে শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্য তুলে ধরার কাব্যকৌশল। তিনি নিজেই যেন এক কলাকুশলী—হয়ত তাঁর 'লোচনদাস কারিগর' কাব্যের নামানুসারে আমরাও বলতে পারি সেই লোচনদাস উৎপলকুমার বসু নিজেই। ( 'লোচন' মানে চোখ, আর তিনি চোখে যা দেখেন সেই চক্ষুষ্মান বিষয়ের অবতারণা করেন কবিতার শব্দে শব্দে। তাই তিনি লোচনদাস, সেই চোখে দেখা বিষয়ের কবিতা কারিগরি নিয়ে, তিনি নিজেই 'লোচনদাস কারিগর'।) এই লোচনদাস কারিগর তাঁর সামান্য এক ভ্রমণকে কিভাবে কবিতা করে তুলতে পারেন তাঁর একটা নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে—

"সেদিন সুরেন ব্যানার্জী রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হল।
তাকে বলি : এই তো তোমারই ঠিকানালেখা চিঠি, ডাকে দেব,
তুমি মনপড়া জানো নাকি? এলে কোন ট্রেনে?
আসলে ও নির্জনতা নয়। ফুটপাথে কেনা শান্ত, নতুন চিরুনি।
দাঁতে এক স্ত্রীলোকের দীর্ঘ, কালো চুল লেগে আছে।" ( রাক্ষস : লোচনদাস কারিগর)

কবি হয়ত কোনদিন সুরেন ব্যানার্জী রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে কার সাথে দেখা হল? নির্জনতার সঙ্গে। নির্জনতার সঙ্গে আবার দেখা হয় নাকি? আসলে কবি চলমান পথেও নিজেই মনের দিক থেকে নির্জনতা অনুভব করছিলেন, কিন্ত বাস্তবে তো সে নির্জনতা নেই, চারিদিকে চলাচলের আওয়াজ। আসলে কবি এত ভিড়ের মাঝেও একাকী হয়ে যেতে পারেন( যেমন জীবনানন্দ হয়ে যেতেন তাঁর 'বোধ' কবিতায়, সকল লোকের মাঝে ব'সে নিজে একাকী হয়ে যেতেন-"আমি একা হতেছি আলাদা...") -তাঁর সেই একাকীত্বে নির্জনতার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। কবি সেই নির্জনতাকে নানান প্রশ্ন করেন। আবার বলেও দেন সেই নির্জনতা হয়ত 'মনপড়া' জানে। কিন্তু পরক্ষণেই কবিতাটি ভেঙে যায়, হারিয়ে যায় নির্জনতা—'আসলে ও নির্জনতা নয়'. কবির চোখ চলে যায় ফুটপাথে কেনা চিরুনির দিকে, আর সে চিরুনির 'দাঁতে এক স্ত্রী

লোকের দীর্ঘ, কালো চুল লেগে আছে।' সামন্য আনমনে পথ চলতে গিয়ে কবি আপনমনে যে নির্জনতা অনুভব করেছিলেন, যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ফুটপাথের নতুন চিরুনি সেই নির্জনতাকে ভেঙে দেয়, চিরুনি দেখেই কবির মনে পরে চিরুনির দাঁতে লেগে থাকা স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কালো চুল, এই চিরুনির দাঁত যেন কবির নির্জনতাকে গ্রাস করে ফেলে, চিরনদাঁত তো গ্রাস করে নেওয়ার প্রতীক, চারিদিকের সংসার এভাবেই তো আমাদের চিন্তার জগতকে গ্রাস করে নেই, তাই কবিতাটির নামকরণ হয় 'রাক্ষস'। 'রাক্ষস' নামকরণের সাথে চিরনদাঁতের একটা সূক্ষ সম্পর্ক আছে। আমাদের চিন্তায় বা কবিরও চিন্তাতে হয়ত চলে এসেছে কোন রাক্ষসের চিরুনির মতো দাঁত। অথচ 'শান্ত' শব্দটি আমাদের একটু ধন্ধে ফেলে দিচ্ছে। চিরুনি যদি রাক্ষসের রূপক বা অনুষঙ্গ হয়, তাহলে সে চিরুনি শান্ত হয় কিভাবে? আসলে সে রাক্ষস আমাদের একাকিত্বের নির্জনতাকে গ্রাস করে নিজে শান্ত হয়েছে, আমরা তাই নির্জনতা অনুভব করেও করতে পারছি না, আমরা অশান্ত থাকছি। আমাদের রাস্তাঘাট, ট্রেন, ফুটপাথ, অর্থাৎ বাইরের চলমান জগতে সর্বত্র এই রাক্ষাসদের কারবার, যারা আমাদেরকে, আমাদের চিন্তা চেতনাকেও গ্রাস করতে চায়। আবার নির্জনতা তো মানুষের একাকিত্বের অনুভূতি। বা কিছুটা নিজের মনের সাথে একান্ত নিভৃত আলাপ। সেই নিভৃত মনের নির্জন অবস্থাও কবির আরেক মানসিক সত্তা। সেই সত্তাকে কবি যেন জ্যন্ত করে তুলেছেন, তাকে ঠিকানা সমেত চিঠি লিখে, ট্রেনে তাঁর আগমনবার্তা সূচিত করে, সেই বিশেষ মানসিক অবস্থাকে আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন। তাহলে এ কবিতার একটা মনস্তত্ত্বও আছে, তা হল নিজের মনের সাথে নির্জনে আলাপ করার ইচ্ছা, বা নিজেই নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকা। কিন্তু রাক্ষসের চিরন দাঁত মনের সেই বিশেষ অবস্থাকে গ্রাস করেছে, পক্ষান্তরে প্রথম তিনটি চরণের 'নির্জনতা', পরের দুটি চরণের আগ্রাসনে কবির অনুভূতিকে ভেঙে চুরচুর করে দিল। উৎপল এভাবেই সামান্য কথায় যেমন অনেক কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন , 'কিছুটা হেঁটেই' বিভিন্ন প্রসঙ্গ একসাথে হাজির করেন—

"আজ কিছুটা হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল কেননা ঘুম ভেঙেছিল ভোরবেলা আজ পশুদের ডাকে-ঐ তো ওনার পায়ে শিকল, রুপোর বাঁধানো, আলো-ঠিকরে পড়া-প্রাণীপোকা, প্রাণহননের কীট, জন্ম থেকে সূচবেঁধে, পিষ্ট ঘাসফড়িঙের গতি নানাদিকে, যন্ত্রণা যে-সব দিক নির্দেশ করে থাকে-আজ একা তেমনই ঝর্ণার পাশে থমকে দাঁড়াই যেখানে একদিন ভেঙেছিল সোনার কলসি....হাউসিং কলোনি থেকে ছিটকে-আসা মাসি -বৌদি-ও মা, ওনাকে চিনতে পারবো না উনি তো কিছুদিন আগেও ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন-...তখন আমরা স্রোত ভেঙে ঝর্ণা পার হওয়ার পথে শুনতে পাই বিজয় তন্ত্র থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ,মৃদু ঘুমপাড়ানি অস্ত্রের ধাতুগান... বহু তরবারির সংঘর্ষে ফুটে ওঠা ঝড়ে পড়া আগুনের বেরীফল...আশা আছে আরেকটু এগোলেই দেখতে পাবো... চায়ের দোকানের মালিক...শস্যক্ষেতে জন্মায় কালো গম...হয়ত আমাদের শেষ পর্যন্ত খালি গলাতেই গান গাইতে হবে যা প্রায় হাহাকারের মতো..." (দন্ডী : খণ্ড বৈচিত্রের দিন)

এখানেও সেই ভ্রমণ- তবে এ হাঁটা সকালের। সকালে হাঁটতে গিয়ে কবি দেখলেন পায়ে বাঁধা রুপোর শিকল, প্রাণহননকারী কীট, পিষ্ট ঘাসফড়িং, এসব যন্ত্রণা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবি ঝর্নার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। অর্থাৎ কবিতার প্রথম প্রস্থে থাকল সকালের আবহে চারদিকের বন্ধনদশা বা যন্ত্রণার ছবি। এসব বর্ণনা দিতে দিতে কবি পৌঁছে গেলেন 'হাউসিং কলোনি'র দিকে, হাজির করলেন একেবারে নিত্যদিনের কথা—'ওমা ওনাকে চিনতে পারব না', বাচ্চাদের স্কুলে পৌছানোর নিত্যকাজ। কবিতার এই পর্যায়ে এসে আবার তিনি বাঁক নিলেন, চলে এল অতীত থেকে ভেসে আসা 'ঘোড়ার খুরের শব্দ, মৃদু ঘুমপাড়ানি অস্ত্রের

ধাতুগান', সেখান থেকে চায়ের দোকানের কথা, শস্যক্ষেতে জন্মানো গমের প্রসঙ্গ থেকে তিনি চলে এলেন খালি গলার গানের প্রসঙ্গে। চারদিকে সকালের ছবিতে শেষ অবদি থেকে গেল এক যন্ত্রণার ছবি, 'সূচবেঁধা' আগুনের বেরীফলের হাহাকার। এভাবে একদিকে হালহকিতের সকালে বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার কথা, হাউসিং কলোনি থেকে ছিটকে আসা মাসি বৌদি মা, চায়ের দোকানের কথার সাথে মিশে গেল 'বহু তরবারির সংঘর্ষে ফুটে ওঠা ঝরে পড়া আগুনের বেরীফল'। কবিতাটিতে আগাগোড়া একটা বন্ধনের ছবি, যন্ত্রনার ছবি ধরা পড়েছে—'যন্ত্রণা যে-সব দিক নির্দেশ করতে থাকে'। সূচবেঁধার যন্ত্রণা, পিষ্ট ঘাসফড়িঙের কষ্ট, ঝড়ে পড়া আগুনের বেরীফল -সবই যন্ত্রনার কারবার। যেখানে ভেঙে পরে সোনার কলসি, ঝর্ণা পার হতে গিয়ে কবি শুনতে পান অতীত থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঘোড়ার খুরের শব্দতো আক্রমনের ছবি, তরবারির সংঘর্ষ রক্তপাতের ইতিকথা। সকালের প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে কবি অতীত থেকে বর্তমানের ভোরবেলাতে জগতের যে ছবি দেখলেন, তা সবই যন্ত্রণার-আক্রমনের-হাহাকারের। এ কারনেই কবি চলতে গিয়ে থমকে গেলেন, 'কিছুটা হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল' কবিকে। শুনতে পেলেন পশুদের ডাক, তবে সে ডাকেও আছে আর্তনাদেও আভাস, কেননা ওই পশুদের পায়ে আছে শিকল আর চারিদিকে ঘুরছে প্রাণহননের কীট। সেই সূত্রেই হয়ত হাউসিং কলোনি থেকে 'ছিটকে-আসা মাসি-বৌদি-ও মা'কে আমরা দেখতে পেলাম, যাদের সংসার জীবনের 'সোনার কলসি'ও যে ভাঙা। অর্থাৎ পশু, ঘাসফড়িঙ থেকে মা মাসি বৌদি —সব জীবদের জীবনেরও যন্ত্রনার ছবি এটা, যেটা খুব অদ্ভুত ভাবে, অতিসুক্ষ ভাবপারম্পর্যে কবি তুলে ধরেছেন। এ কবিতায় আছে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর দ্বিত্ব, কী কী সেই দ্বিত্ব?

★ বিচ্ছেদের দ্বিত্ব— সকালে হাঁটতে গিয়েই কবিকে 'দাঁড়িয়ে পড়তে হল', এ যে স্বাভাবিক পথ চলতে গিয়ে একপ্রকার গতির ছেদ বা থমকে যাওয়া। আবার অন্যদিকে আছে মা মাসিদের 'ছিটকে -আসা', যা হাউসিং কলোনি থেকে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত।

★ ধাতব পদার্থের দ্বিত্ব— এখানে আছে 'রুপো'র বাঁধন, অন্যদিকে আছে 'সোনা'র কলসি ভাঙার গল্প, যা বন্ধনদশা আর ভাঙাভাঙিরও দ্বিত্ব।

★ রঙ এর দ্বিত্ব— লাল ও কালো এই দুটি রঙ ব্যবহার করে কবি জীবনের যন্ত্রণার রূপকে ঘনীভূত করেছেন। যেখানে গমের রং হয় কালো, আগুনের বেরীফল তুলে ধরে অনেকটা লালা রঙের আভাস। কালো আর প্রায় লালা রঙও যে জীবনের/জগতের নেতিবাচক দিকের সংকেতবাহী।

★দুই চলা— কবির চলেছেন ভোরবেলা, পথের 'পরে। ঘোড়া চলেছে বিজয়তন্ত্রের ইতিহাস থেকে।

★দুই কাল— এখানে আছে বর্তমান ও অতীত কালের সহাবস্থান। বর্তমান কালেই কবি দেখেছেন শিকল, পিষ্ট ঘাসফড়িঙ, ছিটকে আসা মা মাসিদের। বর্তমানের জমিতে ফলেছে 'স্বর্ণাভ' নয়, কালো গম। অতীত কাল থেকে এসেছে বিজয়তন্ত্রের ঘোড়ার খুরের চলমানতা, অতীতের ধাতুগান।

★ আওয়াজ/গানের দ্বিত্ব—পশুদের আওয়াজ বা ডাকে কবির ঘুম ভেঙেছে। সেখানে আছে পুরনো দিনের ধাতুগান, যা মৃদু ঘুমপাড়ানি গানের মতো। আবার সেই ডাকের বা গানের রেশ ধরে ফাঁকা গলার যে আওয়াজ বা গান, তা শেষ অবদি 'প্রায় হাহাকারের মতো' আমাদের কানেও এসে ধাক্কা দিতে চেয়েছে। এসবের মেলবন্ধনে, এই পথচলা বা জগতের চলমান ছবিতে লেগেছে কবির অনুভূতির স্পর্শ, চোখের দেখা ও মনের বেদনাও। কেননা এ জীবন যন্ত্রনার গান হাহাকারের মতো। এ কবিতার আপাত বাক্যবিকার, তাই শেষ অবদি জীবনেরই গান হয়ে উঠতে চেয়েছ। উৎপলের এই অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গি, কবিতাকে বহুমুখী করে তোলে। কবিতার একক মূল্যায়ন হারিয়ে গিয়ে তার বিবিধ বিশ্লেষণ নির্মাণ করা যেতে পারে, আর

এভাবেই প্রতিটি পাঠের শেষে তাঁর কবিতা নব নব রূপে পুনঃজন্ম লাভ করে। আবার এই একনাগাড়ে কথা বলা আর বাক্যগঠনে অভিনব বাকরীতি নির্মাণের কাজেও উৎপল স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনা-অতীত ইতিহাস-আর টুকরো দিকনির্দেশকারী টানা বাক্যে কবিতাকে চলমান করে তুলে একটা নতুন বাকরীতি তৈরী করাতেও উৎপল অনন্য। এই বাক্যনির্মাণের অভিনবত্বের সাথে একমাত্র কমলকুমার মজুমদারকেই তুলনায় আনা যেতে পারে। কমলকুমার, যিনি বাংলা গদ্যে এক অভিনব বাকরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, উৎপল ঠিক বিপরীত প্রান্তে বাংলা কবিতা ও গদ্যকে একাকার করে দিয়ে অভ্যেস করেছিলেন অভিনব বাক্যগঠনের এক নতুন প্রান্তর, এভাবেই সৃজিত হয়েছিল উৎপলকুমারের 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা'. মাননীয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যোগসূত্র পত্রিকার অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৯৪ সংখ্যায় 'একটি চিঠি' নামক প্রবন্ধে উৎপলকুমার বসুর বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন, যা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য—

"উৎপলই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন বেপরোয়া ছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সৌজন্যে সে কারণেই কবিতার অন্তশরীরে বুনে দিতে পেরেছিলেন আপাতঅসংগত শাখাপ্রশাখার দুর্জ্ঞেয় আলিম্পনগুণ। 'ইহাতে এই বাক্যগঠনে চোরা রাজসিকতা রহিয়াছে, দর্প রহিয়াছে, যে প্রকৃতির বাড়ি যেন আদি বক্তার নখদর্পণে', কমলকুমার মজুমদারের অমোঘ বর্ণনায় এই নতুন কবিতার চরিত্ররূপ চমৎকার উঠে আসে। এবং এরই জের ধরে বলা যায়, কমলকুমার তখন বাংলা গদ্যে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, বাংলা কবিতায় খুব সম্ভব উৎপলের মাধ্যমেই সেই ক্রান্তি সংঘটিত হয়েছিল।"[৩] বিপরীতক্রমে আমরাও দেখে নিতে পারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস সমগ্রের ভূমিকা অংশে বলছেন— "কমলকুমারের সব ব্যাপারেই বিপরীত যাত্রা।...যেন তিনি খেলা করছেন পাঠকের সঙ্গে, কিংবা তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। কোন কোন বাক্যে রেখে দিচ্ছেন ব্যাসকূট।... ছোট ছোট বাক্যগুলি তিনি জুড়ে দিলেন অসমাপিকা ক্রিয়ায়, তারপর বলতে গেলে বাক্যই থাকছে না, পাতার পর পাতা পূর্ণচ্ছেদহীন ঠাসা রচনা।" উক্ত কথাগুলি কমলকুমারের 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাস সম্পর্কে বলা। যেখানে আছে পূর্ণচ্ছেদের বিলোপরীতি, কমার পর কমা চিহ্ন ব্যবহার করে কথার ভাবসাম্রাজ্য। কমলকুমার সম্পর্কে সুনীলের এই মূল্যায়ন, উৎপলের লেখা সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যায়। উৎপলের লেখাতেও থাকছে 'পূর্ণচ্ছেদহীন ঠাসা রচনা', কমার পর কমা চিহ্ন ব্যবহার করে কথার ভাব সাম্রাজ্য, যার অর্থ করতে গেলে পাঠককে দিক্ষীত পাঠক হতে হবে। যেমনটা কমল কুমারের অভিনব ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে পাঠককে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। কমলকুমারের এই বাক্যরীতির মতো উৎপলের অভিনব কাব্যিক বাকবিভূতি পাঠককে ঘোর লাগিয়ে চলে যায়। উৎপলের বহু কবিতায় এই কমা ,কোলন চিহ্নহীন এমন কি পূর্ণচ্ছেদবিহীন ঠাসা বাক্যের কাব্যকলা বর্তমান। যেমন 'প্রকৃতির ছবি(১৯৬৩)' কবিতার দ্বিতীয় অংশ, 'স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম' প্রভৃতি কবিতায় শুধু পূর্ণচ্ছেদ নয়, কোনপ্রকারের কমা,কোলন, সেমিকোলন চিহ্ন ব্যবহারেরও পক্ষপাতী নন উৎপলকুমার—"আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি আমার আত্মার কোন ভঙ্গি নেই আমার আত্মার কোন বেশবাস নেই শুধু তোমার পথ চেয়ে থাকা ছাড়া তুমি বেশী দূর না গেলে এবার আমি রেলব্রিজে উঠে দেখি ঐ দিকে পেট্রোলঢালা গোল হেমন্তের বাতাস স্তম্ভিত হয়ে লেগে আছে উচুঁ সদৃশ গাছের ডালে আমি লক্ষ্য করি তবু আমার আত্মায় কোন ভঙ্গি জাগে না ইউকালিপটাস থেকে অমাবস্যা অন্ধকারে পাখি উড়ে যায় আমার নিরুজ্জ্বল ভবিতব্যতার কথা ভাবি...স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে আমি বাংলার বাইরে এসে মাঠের আলোড়নের মধ্যে শুয়ে আছি কুয়াশার ঐ পারে সূর্যের ওঠানামা দেখছি এবং দামোদর বাঁধের জলের কিনার দিয়ে হেঁটে আসছে ব্যক্তিগত প্রণয়িনী একা আমি তারই আধোজাগরূক ছাতাপাথরের

মতো মেলে ধরছি মুছে নিচ্ছি শ্যাওলা ও চোখের জলের দাগ" ( প্রকৃতির ছবি/১৯৬৩) —এ কবিতার ভাব সৌকর্য্য কবির আত্মার সাথে পাঠকের আত্মার যোগাযোগ দাবি করে। আর গঠনগত দিক দিয়ে এই বাক্যনির্মাণ প্রণালী উৎপল ছাড়া অন্যকোন কবির কাব্যগাঁথায় খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কথা সাহিত্যের দিক দিয়ে একমাত্র কমলকুমারকেই স্মরণে আনা যায়। আবার এ-ও বলা যায় কমলকুমারের কথা সাহিত্যে যে কাব্যিক ছোঁয়া আছে, অনুরূপভাবে উৎপলকুমারের কাব্যসাহিত্যে আছে গদ্যের ভাবমাধুর্য। সুনীল কথিত এই পাতার পর পাতা ঠাসা রচনায় কমলকুমার ব্যবহার করছেন কমা চিহ্নকে, সেখানে উৎপলে আছে হাইফেন ব্যবহারের আধিক্য। বাক্য নির্মিতিতে উৎপল গুরুত্ব দিয়েছেন হাইফেন ব্যবহারে। উৎপলের 'স্মৃতি', 'কুসংস্কার সমন্ধে কবিতা', 'টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম' প্রভৃতি কবিতায় -"শীতের সকাল — নুয়ে দেখছি গতরাত্রির বাফুনমাতাল— ছুঁয়ে দেখছি কালো পাথর — এই টেবিল আমার নয় — আমার ছিল হপ্তাশেষ ঘূর্ণিনেশা— লাটিম, তুমি সতর্ক নও, ছেঁড়া-তারে জড়িয়ে পড়া ট্রামে ছিলাম, দৈববশে— দু-লাইনের টেলিগ্রাম এই সূত্রে পাঠাচ্ছি যে— টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও।"( টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম) এরকম বাক্যবাণ আমাদের চিন্তায় এসে আঘাত করে, আবার হাইফেনের বাজার থেকে উঠে আসে টাকা পাঠানোর জন্য কাব্যিক টেলিগ্রামের বয়ান। কিংবা 'স্মৃতি' কবিতায় যুগপৎ থাকছে 'ভুল' শব্দের ধুঁয়া ও হাইফেনের কারবার—"যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার সৌভাগ্য ছিল অরুন্তুদ ভাগ্যবিপর্যয়, অল্প আগুনে সেঁকা কালো জিরে, গন্ধবহ — অথবা বাবর চটি — আমার সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়শাসন — ভুল বিদ্যাশেখা — ভুল আবিষ্কার — ভুল প্রজনন — ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড — ভুল ধূপাধার — ভুল পুষ্করিণী — ভুল দেবদারু — ততোধিক ভুল স্মৃতি..." একই বাক্যে একাধিক বার হাইফেন ব্যবহার কি কবিতার ক্ষেত্রে অভিনব নয়? সেই হাইফেন গুলি কি একাধিক 'ভুল'এর গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে না? অনুসন্ধানী পাঠক নিশ্চয় এর উত্তর সন্ধানে ব্রতী হবেন, কেননা স্বয়ং উৎপলকুমার বসুর মতে "কবিতা আমরা জানি কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা, পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পদ্ধতি।" উৎপলের কবিতা এভাবে পাঠকের মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বাক্যগঠনে উৎপলের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও পাঠককে নড়চড়ে বসতে বাধ্য করে, আর উৎপল 'ভুল বিদ্যাশেখা'র হাত ধরে কবিতাতেও ভুলকে প্রশ্রয় দেন-

"কবিতায়, আগ্রহাতিশয্যে, আমি আরো অনেকের মতো
দু-চারটে ভুল-টুল করে ফেলি। ছন্দের ব্যাপারে তত
অবহিত নেন উনি —কোন মাস্টার বলেছিল।
শিক্ষার অভাব আছে — এমনও শুনেছি। সব কিছু

ঔদাসীন্যে মনে নিই।"( ৮ নং কবিতা : সুখ-দুঃখের সাথী) — উৎপলের এই অকোপট উক্তি পাঠককে মোহিত করে, তখনই পাঠক ভুল এর মাঝ থেকে নতুন নতুন বাক্যরীতির ঝলকও খুঁজে পান, যা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র উৎপলের অবদান। এমন কি বাক্যগঠনে SYNTAX কেও উৎপল ভেঙেচুড়ে দেখেছেন, সেখান থেকে নতুন কোন বাকরীতি আবিষ্কার করা যায় কিনা। কবিতায় নতুন বাক্যবিন্যাস বা SYNTAX এর কিছু কিছু উৎপলীয় কারিগরিও আমরা দেখে নিতে পারি—

"হস্তচালিত প্রাণ তাঁত সেই আধোজাগ্রত মেশিনলুম আমাদের হুর রে " ( উৎসর্গ : পুরী সিরিজ)
"জাগো, রাণা কমলালেবুর বীজ, প্রতাপের মতো,"(শীতকাতর ঘুমের ভিতর গভীরতর শীতের ঘুম আছে : লোচনদাস কারিগর), এরকম টুকরো টুকরো অভিনব SYNTAX এর উদাহরণ ছাড়াও উৎপলের কবিতা থেকে সহজেই হাজির করা যায় গোটা গোটা কবিতার বাক্যবিন্যাস, যা উৎপলের নিজস্ব রচনাশৈলী—

"যা ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্রব্যবহার লিখতে হবে বা আপনার উচিত ঠিক শব্দ ব্যবহার কি আবশ্যকতা যদি না হয় তবে বিচারে ফল নাই এই গ্রন্থে হিন্দী এবং ইংরাজি উভয় পদ্ধতিই অনুসার হল আপনাদের উচিত নিজেকে প্রস্তুত করা...

এবং আমাদের এই প্রয়াস গ্রন্থরচনার আড়াআড়ি দপ্তরীদের দোকান অধিকাংশ মুসলমান তা হোক পদ্ধতি অনুসার হয় ইলাহি যেমন দুরভিগ্রহ ও দেহাতী ভূষণ ও বজ্রচামর রক্ত ও তেল কিন্তু বিচার নাই আমরা চাই পরিবার চাই রেশনের বাইরে ঘর পিছু সম্বৎসর চাল ও জ্বালানি ও সরিষা মাথা পিছু দুই কেজি উক্ত দরখাস্তে আমাদিগের সই ছিল সাতজন অনুপস্থিত অর্থাৎ মৃত বা রুগ্ন আমাদের তিনজনের সই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হোক এই আবেদন" (স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম : পুরী সিরিজ)— এই বাকবিন্যাস বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রায় অমিল, এরকম বাক্যসৃজন করার দুঃসাহস একমাত্র উৎপলেই সম্ভব। অর্থাৎ বাক্যের ভাব বা content নিয়েই তিনি ভাবছেন না, সেখানে থাকছে বাক্যগঠন নিয়ে কবির চিন্তা। কবিতাকে ছাপার অক্ষরে কেমন লাগবে সেসব চিন্তাও তাঁর মধ্যে কাজ করত। আর এসব নানা খেলা খেলতে গিয়েই উৎপল SYNTAXকে নিয়েও খেলা করেছেন। উৎপল এমনটা কোন তাড়নায় করছেন? তার উত্তর এই হাংরি আন্দোলনের শরিক কবি উৎপলের ডায়েরি বা ২২.১০.১৯৬৪ সালে দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে আত্মগোপন করে আছে। উৎপল তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখছেন GERARD MANLEY HOPKINS এর একটা লাইন— কোটেশন দিয়ে,-"Hopkins was always ready to disturb the usual word order of prose to gain an improvement in the rhythm or an increased emotional poignancies", এই usual word order কে disturb করতে উৎপলও বিশেষ ভাবে সক্ষম। কিংবা উক্ত দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে অকপটে স্বীকার করছেন সে কথা-"আর, আপনার সেই লোকসঙ্গীত সংগ্রহের কি হল? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ওগুলো ঘাঁটলে আপনি নিজস্ব কবিতা লেখার উপযুক্ত অনেক বিচারবিবেচনা করে দেখতে পারবেন। ভুল বাংলায় আগের লাইনটা লিখলাম। আমি বর্তমানে বিবিধ ধরণের ভুল Syntax পছন্দ করছি।" আমাদের মনে রাখতে হবে এই চিঠির সময় কাল ১৯৬৪ সাল অর্থাৎ হাংরি আন্দোলনের হাওয়া চলছে বাংলা সাহিত্যে। তাই উৎপলের এই অভিনব ভিন্ন পথে পদচারণ? কেননা সে সময় পর্বে তাঁর কবিবন্ধু মলয় বা শক্তিরা নিজস্ব আঙ্গিকে পথ চলার দুঃসাহস দেখিয়ে ছিলেন। এই ভুল syntax পছন্দ করাও কি উৎপলের উপর হাংরির অভিঘাত! যে হাংরি বুলেটিনে কবিতা লেখার জন্য তাঁর চাকরি চলে গিয়েছিল। কবিতা লেখার জন্য চাকরি চলে যায়, সেই নজিরবিহীন ঘটনার, বাংলা সাহিত্যে একমাত্র উদাহরণ, খুব সম্ভবত উৎপলকুমার বসু। তথাপি উৎপল তাঁর নিজস্ব রীতিতে বারবার কবিতা লিখেছেন, কখনও শব্দ, ভাষা, চিহ্ন, বাক্যগঠন আবার কখনও ছন্দ আলঙ্কার চিত্রকল্প রচনাতেও নিজস্ব শৈলীর পরিচয় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন-"ভালো লোক মাত্রেই একটা স্বকীয় লিখনরীতি থাকে — কিন্তু বড় লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা শক্ত", কথাটি উৎপল সম্পর্কেও প্রযোজ্য, তাঁর লিখনরীতি বিবিধতার এত আঙ্গিক নিয়ে গড়ে উঠেছে, যে সেখান থেকে প্রতি পাঠ শেষে উঠে আসে কবিতার নব নব অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। আর উৎপল ততই আমাদের কাছে টানেন, বলে দেন - "একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে।...কোরা কাপড়ের গিঁট, অন্ধক্রোধ —একদিন দেখো তুমি খুলে।" (উৎসর্গ পত্র : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

উৎপলের কবিতায় একটা ভ্রমণ আছে, "সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। / বাতাস বইছে বেরিয়ে-পড়ার বাতাস," যেন তিনি পথে বেরিয়েছেন, দু'চোখে তুলে নিচ্ছেন ঘটনা থেকে বিষয়, মাঝে

রেখে দিচ্ছেন সংসারের নানা চলাচল। স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে 'ক্রশকবর', বর্তমান থেকে উঠে আসছে 'মেশিনের মত নিতম্ব'. সময়কে নতুন করে দেখা আবার পুরানোকে পর্যালোচনার হাত ধরে কবি বেরিয়ে পড়েন 'সদাভ্রাম্যমাণতার' পথে—

"একদিন সকালে, ছুটির দিন-আমি, সহকারী, অনাদনাদ রায় এবং তাঁর স্ত্রী সুচারু পাহাড়ে বেড়াতে বেরলাম।... নীচে লতাগুল্ম পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে যেতে থাকলাম উপরের দিকে। এগুলি বনতুলসী, এবং এগুলি বিছুটি না ছোঁয়ায় ভালো।... ছায়া পড়ে নীচে একটি গ্রামের উপর (সোনডিমরা) ঐখানে সহকারী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ক্রুশকবর...চকমকি ঠোকার শব্দে আমি শুনি হাহাকার...আমি দেখি সাংকেতিক পাথর।আদিম পুরুষ কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল। তাঁরই বিজ্ঞাপন।...সুচারু দেবীর... কোমরের-খাঁচ এবং কৃশপিঠের নিচে ফুলে ওঠা মেশিনের মতো নিতম্ব, ধক ধক শব্দে নড়ে ওঠে বেসামাল চর্বি ও বারুদের অপপ্রচার।... আলো ও ছায়ার বীজগণিত...আমার মাথার মধ্যে আর্তনাদ করে ওঠে কবিতা..বুলেট বেঁধা মহান কাচ।" (শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা অংশ)—ঘুরতে ঘুরতে কবি যা দেখেন, বর্তমান চলমানতা বা প্রাচীন অতীতের 'অবতংশ' সে সব দেখেই কবির মধ্যে কবিতা আর্তনাদ করে ওঠে—কবি সেই তাড়নায় শুধু পা চালান না, সঙ্গে চলে তাঁর মনন ঋদ্ধ কলম। উৎপলের কবিতায় এই ভ্রমণের একটা বিশেষ অবস্থান আছে। সে পথ পরিক্রমা কবির দৃষ্টিতে নতুন এক জগতকে নিয়ে আসে-যে জগতকে আমরা সেভাবে কোন দিন লক্ষ্য করিনি- কিন্তু উৎপল করেছেন। কবি তাঁর সহকারী 'অনাদনাদ রায়'কে নিয়ে বেড়াতে বেড়োলেন, সঙ্গে এক মহিলা। অনাদনাদ রায় বিশেষ্য পদটিও আমাদের চোখ ও কানকে টানে, কেননা এ নাম অনাদ আবার নাদ'ও। সুতরাং শব্দ ডমরু কিছুটা হলেও কানে বাজে। আবার আরেকটি বিশেষ্য পদে 'সুচারু' —সেটা ওই মহিলার নাম না কি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেটাও ট্যুইস্ট, কেননা 'তাঁর স্ত্রী সুচারু পাহাড়ে বেড়াতে বেরলাম' এর মাঝে কমা চিহ্নের অভাব আছে। (আবার সুচারু যে ওই মহিলারই নাম সেটা কবি কবিতার মধ্য পর্যায়ে গিয়ে জানিয়েছেন), তো এই পাহাড় দেখতে গিয়ে কবি প্রকৃতিকে তো দেখলেনই না, বরং সেখানে থাকল বনতুলসীর বুনো গন্ধ, বিছুটির ছোঁয়া, আর ক্রুশকবর। সঙ্গে আলো ছায়ার খেলা। সুতরাং একটা ওয়াইল্ড ভাব আর ইতিহাসের আয়োজন করলেন তিনি। ওয়াইল্ড একারণেই যে ওখানে আছে পাথর, বনতুলসী, লতাগুল্ম, আদিমপুরুষ (আমাদের আদিম পুরুষরা বনে বাস করতেন সেটা আমরা সবাই জানি)- এসব নিয়ে পরিবেশটা আর প্রকৃতিক সৌন্দর্যের থাকল না, হয়ে গেল বন্য। এই আবহে কবির চেতনা যেন ইতিহাসকে স্পর্শ করেছে। কেননা আদিম পুরুষের বিজ্ঞাপন দেখার আগেই 'ক্রুশকবর'এর সংকেত আছে। এই ক্রুশকবর মানে যারা মৃত, সেই অতীতের সমাধি ওটা, যা ইতিহাসকে পাশে বসাতে চায়। (আবার ক্রুশ শব্দটি কি খ্রিষ্টান বা ব্রিটিশ ইতিহাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে!) সুতরাং পাহাড় দেখতে গিয়ে কবি চলে গেলেন আদিম যুগের কালে, পাথর দেখে মনে হল সেখানে আদিম মানব কিছু লেখার চেষ্টা করেছে, চকমকি ঠোকার শব্দে সেকালেও যে হাহাকার ছিল, তারই বিজ্ঞাপন যেন পাথরের গায়ে খোদায় করা হয়েছে। এ ভ্রমণ তাহলে ইতিহাসের ভ্রমণ। কিন্তু যেই পাঠক ভাবতে বসলেন, আরে এ নিছক ইতিহাসের কচকচি, তখনই সুচারুর কোমড়, আর পিঠের নিচে নিতম্বের চলন দেখে মনে পড়ে গেছে আধুনিক কালের মেশিনের চলন ও তার ধক ধক শব্দ। অতীত কালের হাহাকার থেকে বর্তমানের 'চর্বি ও বারুদের' আগুনখেলা কবির চেতনায় স্থান করে নিয়েছে। এমন কী চলে এসেছ 'বুলেট-বেঁধা' রক্তারক্তির আভাস। কবি ভ্রমণে গিয়ে না পেলেন শান্তি, না দেখলেন সবুজের

লীলা, শুধু অতীত থেকে বর্তমান অবদি হাহাকার আর আর্তনাদ শুনলেন। অতীতের সাংকেতিক চকমকি পাথর, বর্তমানের চর্বি আর বারুদ মিশে কবির চেতনাকে উত্তপ্ত করে তুলল।

আবার অগ্রন্থিত কবিতার ২৪ নং কবিতায় আছে রাজনারায়নপুর ভ্রমণের কথা, কবি সেখানে গাড়ি করে যাবেন। সেখানের 'উইটিবি' দেখে হয়ত কবির মনে পড়ে যাবে কোন গ্রামের বাল্যকালের স্মৃতি, যে গ্রামের দেওয়ালে আগে আলকাতরা মাখানো থাকত, একদা যে গ্রামে জমিদার বাড়ি ছিল, কিন্তু আজ তা ইতিহাস-সেখানে জমে থাকা শ্যওলা নিয়ে কবি গবেষণা করবেন অতীত দিনের নানা হিসাব নিকাশ। পুরানো দিনের স্মৃতির কথা মনে পড়ে গিয়ে কবির চোখ 'কালোপাখির ছায়ায় ভরে যাবে-কবির চোখে জল চলে আসবে, আর এসব দেখে স্থানীয় লোকের বলবে—"কাঁদছ কেন গা তোমরা?", নিছকই এক পুরানো স্থান ভ্রমণ এবং সেখানে গিয়ে অতীত স্মৃতির বেদনাকে নিয়ে উৎপল ঘুরে আসেন রাজনারায়নপুর, কবিতাটি নিম্নরূপ—

"কাল সকালে গাড়ি আসবে। আমরা রাজনারায়নপুর যাব। হয়ত সেখানে দেখতে পাব উইটিবি। আলকাতরা-মাখানো বাড়ির দেয়াল। জমিদারবাটীর সিঁড়িতে যে-ধরনের শ্যাওলা জমে থাকে তা-নিয়ে আমার গবেষণা খানিকটা এগোবে। ছিল বটে সে-সব দিন-বলতে বলতে আমাদের চোখ কালোপাখির ছায়ায় ভরে যাবে। কাঁদছ কেন গা তোমরা?... স্থানীয় লোকেদের এসব প্রশ্নের জবাব আমরা আগে থেকেই গাড়িতে যেতে যেতে স্থির করব।"

উৎপল শুধু স্থানিক ভ্রমণে তৃপ্ত নন, সে ভ্রমণের ব্যাপ্তি সমুদ্র নক্ষত্র থেকে বিশ্বলোক, বর্তমানের সুরেশ সরকার রোড থেকে মগধ তক্ষশীলা অবদি বিস্তৃত। জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও এই অতীত স্থান ভ্রমণের ব্যপ্তি আছে, আছে 'হাজার বছর ধরে' পথ ঘোরার কথা, কিন্তু শেষে তিনি যে বনলতাকে পান তার মাঝে থেকে যায় অন্ধকার। কিন্তু উৎপল সেই অন্ধকারকে সরিয়ে রেখে নিয়ে আসেন সাম্প্রতিক 'সুরেশ সরকার রোডে'র শান্তি—

"শিশুটি উঠোন ধরে দৌড়াচ্ছে - 'মাইয়া গে'।...
মগধ থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি-
যাবো তক্ষশীলা...
বৈশালীতে জমি ছিল -পাহাড়ের গা-ঘেঁষা...
জলের উপর দিয়ে আলো ক্রমে সরে যাবে-
চারুবাক( পদস্থ কেরানি) হাঁসগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবছে সন্ধে হল,
ঘরে ফিরি,
বৈঠকখানায় বাজার আর এন্টালিতে যানজট-...
...আমি পত্রবাহক,
গ্রীকদরবারে এই শর্ত পৌঁছে দিলেই
হাজার গ্রন্থি জমি এবং এক হাজার গ্রীক স্ত্রীলোক
মগধ ও লিচ্ছবিরাজ্যে বিতরিত হবে,
-সুরেশ সরকার রোডে শান্তি ফিরে আসবে।" (৪৯ নং কবিতা : অগ্রন্থিত কবিতা)

যে কবিতাটি একটা শিশুর দৌড়ান দিয়ে শুরু হয়ে বিভিন্ন বিষয় দেখাতে দেখাতে হঠাৎ চলে গেল মগধ তক্ষশীলা, সেখান থেকে চলে এল এন্টালির যানজট, গ্রীক দরবারে পত্র পৌঁছে দেবার বার্তা থাকল, যা মগধ

ও লিচ্ছবিরাজ্যে বিতরিত হবে। পরের পংক্তিতে একটি স্পেসের পর তিনি জানালেন তাহলে সুরেশ সরকার রোডে শান্তি ফিরে আসবে। অর্থাৎ গ্রীকের ইতিহাসের অস্থিরতার সময় পেরিয়ে কবি বর্তমানের সময়ে শান্তিকামী। ইতিহাস ভ্রমণ করে জীবনানন্দ অন্ধকারের মধ্যে হয়ত একটু শান্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু উৎপল সেখানে ভিন্ন, সেখান থেকে জেগে ওঠে এক বিশাল শোভাযাত্রা—

"আমার পশুআত্মা একদিন স্নানশেষে ঐ ঢেউ থেকে উঠে আসবে।
পিছু পিছু উঠে আসবে এক বিশাল শোভাযাত্রা-
গন্ধবনিকদের, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারকদের, যারা মোমবাতি বানায়,
যারা উল্কি কাটে, বঁটি শান দেয়, যারা শাঁখারী -...
-সবাই আসবে।" (৪৯ নং কবিতা : অগ্রন্থিত কবিতা) —অন্ধকারে পড়ে থাকা নয়, দু'দন্ডের শান্তিই শুধু নয়, উৎপল সেই ভ্রমণে বেড়িয়ে তুলে নিয়ে আসেন গ্রীকদরবারে পৌঁছে দেওয়া শর্ত আবার সেখান থেকে উঠে আসে নিম্নকর্মজীবি সম্প্রদায়রাও— যারা মোমবাতি বানায়, উল্কি কাটে, বঁটি শান দেয়,, যারা কামার। উৎপল জগতভ্রমণে বেড়িয়ে ইতিহাসের দরবার থেকে নগর কেন্দ্রিক কলকাতার রাস্তা থেকে মানুষদের তুলে আনেন, তেমনি আবার কখনও কখনও পৌঁছে যান প্রান্তিক জনপদে, কখনও বক্সীগঞ্জে, কখনও উত্তর চব্বিশ পরগনায়, আবার সহজ সরল ঝরঝরে ভাব নিয়ে চলে যান নতুন বৌ এর সাথে আলাপ করতে—"বালক বালিকা ও পেশীবহুল আত্মীয় -সভার কাছে আমি দাবি করি -কই হে, আমাকে একটা ঝুমঝুমি দাও, যে-কটা দিন আছি টেনে বাজাই।...যখন এবারের পঞ্চায়েত উপনির্বাচনে কথা ভাবছে, তখন আমিই হঠাৎ বলে উঠি- যাই চাটুজ্জেদের বাড়ি নতুন বৌটির সঙ্গে দু-কথা কয়ে আসিগে।" ( ৪ নং কবিতা : কহবতীর নাচ)—কখনও কবি মন চলে যেতে চান গ্রামের দিকে, যেখানে কুয়ো আছে -আমের বাগান আছে-গ্রামের গ্রাম্যতা আগের চেয়ে অনেকটা সভ্য হয়েছে। সরকারি দাবি দাওয়ার চাপান উতোরকে এড়িয়ে কবি চলে যেতে চান সীমান্ত পেরিয়ে-নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে—

"ছাতা নিয়ে অটো-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যায়, দূর দেশে যাওয়া
যেতে পারে, পালিয়েই যাব, রংপুরে, গ্রামের দিকে,
ছোট পিসিমার জমির একটা ঘর খালি পড়ে আছে,
কুয়ো আছে, আমের বাগান আছে, কুকুরের ছানাগুলো
এতদিনে নিশ্চয়ই অনেকটা সভ্য হয়েছে...

আয় তোরা সরকারী দাবি -দাওয়া নিয়ে, আমি ততক্ষণে, সীমান্ত পেরিয়ে বনগাঁ ছাড়িয়ে, দৌড়ে চলেছি।" (১৭ নং কবিতা : সুখ-দুঃখের সাথী) নগরকেন্দ্রিক কবি একটু গ্রামের শান্ত পরিবেশে পা বাড়াতে চান, সে ইচ্ছার সাথে হয়ত জড়িয়ে আছে গ্রামের স্মৃতি। আমবাগান কুয়ো তলার পাশে গিয়ে কবি নিভৃতে কিছুকাল কাটাতে চান, যেন শহরের উত্তাপ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। পথ প্রেমিক এই কবি শুধু নগর গ্রাম বা অতীত বর্তমানের কথা বলতেই বাইরে বেড়োন নি, বলতে চেয়েছেন পথের কথা, যে পথ কখনও সবুজ সুন্দর আবার কখনও সময়ের চাপান উতোর ও জীবনের নানা চলমানতার চক্ষুষ্মাণ জলছবি—" দেখে এলাম সবুজ, সুন্দর রথ...আমি শুধুই পথের কথা বলতে এসেছি, অন্য কিছু নয়-" (২১ নং কবিতা : সুখ-দুঃখের কবিতা), উৎপলের ভ্রমণে এভাবে চলে আসে সংসারের কথা, কখনও তার সাথে লিপ্ত হয় বর্তমানের সাম্প্রতিক ঘটনা, কখনও সেখানে থাকে মানস ভ্রমণ-

"গিয়েছিলাম মনে মনে

মথুরাভ্রমণে
যেন-বা উড্ডীন পাখি
নিজেকেই ভেবে রাখি—
অক্ষরে নিবদ্ধ কবি
যেন শৃঙ্খলিত চিত্রী ও ছবি..
আনন্দবায়ু, তুমি আমার সারথি।...
উড্ডীনে ভরে আছে আমার আলয়।
ঝড়বৃষ্টি হয়

সূর্য ওঠে এই ঘরে, রাত্রি নামে।"( ১৪ নং কবিতা : সুখ-দুঃখের সাথী) —উৎপলের কবিতায় এই সহজ সরল উক্তিও অমিল নয়, কত সহজেও তিনি কথা বলতে পারেন এটি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে আছে মানসভ্রমণ। এখানে আছে শিশুসুলভ পাখির মতো ওড়ার সাধ। "কভু ভাবি পাখি হয়ে / উড়িব গগনে।"( সাধ: রবীন্দ্রনাথ) আবার এই যে মানসউড্ডীন সেই সূত্রে কবি এঁকে চলেন জগতের ছবি, কবিও হয়ে ওঠেন চিত্রী। ভ্রমণের সাথী হয় আনন্দবায়ু। আবার অকপটে তিনি বলে দেন, আমাদের সংসারেও হয় ঝড় বৃষ্টি, আমাদের দিন রাত্রির চলাচলের মাঝেও আমরা মাঝে হয়ে যায় শিশুর মতো, শিশুর সাধ কার না থাকে? কবিতাকে এভাবে হালকা করে -শুধু কথা নয়, কখনও রেখা রঙ এর মত অল্প ইঙ্গিত দিয়ে, তাকে ছবিতে পরিণত করাও উৎপলের নিজস্বতা।

বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কবিতাকে এক বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত করা, তাকে কারুশিল্পের মত এক নতুন আঙ্গিক প্রদান করা যেমন উৎপলের নিজস্ব ধরণ, ঠিক তেমনই স্মৃতি সাইকি আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কবিতাকে সর্বত্রগামী করে তোলা উৎপলের 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা'। আসলে উৎপলের রচনার মধ্যে যে বিবিধ স্বতন্ত্র্যতার সমাবেশ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা তথ্য, নানা আদল, নানা কারিগরি বিদ্যার রসায়ন। যাকে কবি স্বয়ং বলেছিলেন, কবিতা ম্যজিক রসায়ন ও দক্ষতা। এই কবিতা রসায়নে কখনও জারিত হয় নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর নানা টানাপোড়েনের কথা। কলকাতার সমাজ, রাজনীতি, নানা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ঘটনার অভিঘাত যেমন তাঁর কবিতার শরীরে চুপ করে প্রবেশ করে যায়, তেমনি কখনও কখনও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলিও উঁকি মারে থেকে থেকে। সে সব সমাজের চরিত্রগুলির কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় তাদের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো। তাদের জীবন চলাচলের নানা অনটন - নানা না জানা কথার হেঁশেল ঘর, যা উৎপলের কবিতা। এই মধ্যবিত্ত সমাজকে কবিতায় একটা বিশেষ স্থান দেওয়াও উৎপলের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ঠ। সমাজের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি থেকে দরিদ্র সমাজের কথা জানাতে গিয়েও উৎপল ভোলেন না মধ্যবিত্ত সমাজকে। তাঁর কবিতায় নূন্যতম কর্মের কেরানি, পিওন, কানুনগো, মহুরি প্রভৃতি জনগনরা একে একে উঠে আসে, তাদের সংসারে যে সংগ্রাম চলে—যে হোমাগ্নি জ্বলে সেসবকে কবি তুলে ধরেন—

"প্রতিটি হোমাগ্নির কাছে হাঁটু মুড়ে বসব আমি, জানতে চাবি তার রসায়ন, ভূত বিজ্ঞান, তার জ্যোতির্বিদ্যা, কী উপায়ে সে ফুটিয়ে তোলে হিন্দোল হাঁড়ির ভিতর পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল "( রণনিমিত্ত হৃদয় আমার : লোচনদাস কারিগর) অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সংসারের হাঁড়ির খবরও কবি জেনে নিতে চান। জেনে নিতে কিভাবে মধ্যবিত্ত সমাজে পুঁই শাক আর কলায়ের ডালে গ্রাসাচ্ছদন করে। সেই মধ্যবিত্ত সংসারের রসায়ন, তাদের জীবনবিজ্ঞানও কবি জানতে চান। তাদের সংসারের 'ভূত' ও ভবিষ্যৎ (যেহেতু কবি

জ্যোতির্বিদ্যা মতে ভবিষ্যৎ জানার মুখাপেক্ষী) নিয়ে কবির চিন্তা হয়। শুনতে পান হাঁড়ির রান্নার আওয়াজে 'হিন্দোল' নামক রাত্রিকালীন রাগ বা গান— যে গান কোন মতে দিনযাপন করার গান। উৎপল মাঝে মাঝে চলে আসেন এই মধ্যবিত্ত সংসারের গণ্ডীতে, তাদের সাথে কথা বলেন এবং তুলে ধরেন তাদেরই কথা। আসলে এই লোচন দাস কারিগর পর্যায়ে এসে উৎপলের কবিতার সামগ্রী হতে থাকে রোজ জীবনের নানা কাহিনী বা ঘটনা বা চক্ষুষ্মানতা। কবি জানিয়ে দিতে চান এই মধ্যবিত্ত জনগণদের বাজারে কত দেনা থাকে, মুদির দোকানে থাকে কত বাকি, ছেলের চাকরির দরখাস্ত থেকে মায়ের মানত, ট্রামের টিকিটের হিসাব থেকে লটারির কুপন- এসব থেকেই বোঝা যায় তাদের আর্থিক অনটনেরও বাস্তব চিত্র। এই অনটনেই চলে তাদের সংসার—ক্ষীণ দুর্বল আশাকে আঁকড়ে ধরে চলে তাদের জীবন—

"সমস্ত জড়িয়ে যায়, যেন লাল-কালো সুতোর কুন্ডলি, চাকরির
দরখাস্ত, বাবার অসুখ আর মায়ের মানত, ছোট বোন
আন্না দিয়ে খোলে গিঁট, চেষ্টা করে, সে তো প্রায় অসম্ভব,
সমগ্রে জড়িয়ে থাকে, ট্রামের টিকিট আর লটারীর কুপন,
বাস্তব-কাল্পনিক,... তালেগোলে অক্লেশে গড়িয়ে চলে
ঢালু দিয়ে, বাজারে ও সংসারে..." (বিকট স্বপ্ন : অগ্রন্থিত কবিতা) -এ তো রীতিমতো এক মধ্যবিত্ত সংসারের ছবি, যেখানে লাল কালো অভাব আর আশা কল্পনার কথা বর্ণিত হয়েছে। লাল আর কালো দুটো রঙই জীবনের নেতিবদী দিকের ইশারা দিয়ে যায়। বাবার অসুখ থেকে চাকরির কল্পনা যেন শেষ অবদি কুণ্ডলীর মতো পাকিয়ে যায়, বোন সেই সংসারের কুণ্ডলীকে খুলবে কী করে? কেননা মধ্যবিত্ত সংসারে একটা মেয়েও চিন্ডার বিষয়, তার বিবাহ - তার রক্ষনাবেক্ষণ করতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। তাই মা ছেলের চাকরির জন্য মানত করতে বাধ্য হয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে মানত সফল হয় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে তো এ চিত্রই দেখা যায় যেখানে সামান্য একটা । অসচ্ছলতার বাস্তব আর সচ্ছলতার কল্পনাকে আশ্রয় করে তারা বেঁচে বর্তে থাকতে চায়। মধ্যবিত্ত সংসারকে এভাবে কবিতায় হাজির করার ক্ষেত্রে উৎপল অনেকটাই এগিয়ে। পাঁচের, ছয়ের দশকে বাংলা সিনেমায় যেমন দেখা যেত নগরকেন্দ্রিক কলকাতা কিংবা মধ্যবিত্ত সংসারের নানা অভাব অনটনের ছবি (উৎপলের কবিতাগুলিও কোথও যেন সেই চলচ্চিত্রের টুকরো ঝলক আমাদের স্মরণে নিয়ে আসে)—উৎপলের কবিতাতেও তার কিছুটা রেশ পাওয়া যায়। যেখানে সংসারের নানা রকম খরচ যোগাতে হিমশিম খেতে হয় মধ্যবিত্তদের। উৎপল সেই সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, বন্ধুর হাতে হাত রাখলেই বুঝতে পারেন বাজারে তার কত দেনা—তাঁর সংসারের আরও নানারকম সমস্যার কথা—

"বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই তোমার বাজারে অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো, বন্ধু।" ( ৭ নং কবিতা : সলমা-জরির কাজ) কবিতাটির শুরুতে এবং শেষে 'বন্ধু' শব্দটি দুবার ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির কথা আবার তার ফাঁকেই জানিয়ে গেলেন মধ্যবিত্ত ঘরের অভাব অনটন, কিশোর কিশোরীদের বিপথগামী হওয়ার জন্য বাবার চিন্তার কথা, যে সব চিন্তায় কবির সেই'বন্ধু'টির রাতে ঘুম আসে না। সুতরাং এই সামান্য আশ্রয়ের সংসারে নানারকম চিন্তার মেঘ সদা জেগে থাকে, 'মেঘে ঢাকা তারা'সিনেমার মতো সংসারের উপর সর্বদা বিরাজ করে কালো মেঘ—

"দিদি ধন্যবাদ। আমি হলেবীদ মন্দিরের
স্ত্রী যক্ষ মূর্তিটিকে হেসে বলি,
এসো, আমাদের সামান্য আশ্রয়ে একদিন
থাকো, আতিথ্য গ্রহণ করো, আমাদেরই সংসারের
উত্থানপতনে ভ্রষ্ট হও, জয়ী হও,
আমাদের আনলা শেয়ার করো, এই তাকে বই রাখো...
আমাদের সংসারের উপর চিরদিন কালো মেঘ, অনেক ঝড়, অনেক বজ্রপাত-" (৩৪ নং কবিতা: অগ্রন্থিত কবিতা) —কবিতাটিতে তিনি পুরাণের যক্ষমুর্তিকে দেখে 'দিদি' বলে সম্বোধন করলেন। মন্দিরের মূর্তিকে দিদি বলে যেন তাঁকে আপন করে নিল কবি। শুধু আপনই করল না, তাঁকে আহ্বান জানাল 'আমাদের সামান্য আশ্রয়ে একদিন' থাকার। অর্থাৎ আত্মীয়তা স্থাপন করতে চাইলেন। আর জানিয়ে দিতে চাইলেন আমাদের সংসারের নানা অনটনের কথা-'আমাদের সংসারের উপর চিরদিন কালো মেঘ,', জীবনানন্দ দাশ বনলতাকে অতীতের কাল পেরিয়ে যখন দেখতে পেলেন, তখন তাকে কাছে বসালেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে ছিল মুখোমুখি বসিবার অন্ধকার অর্থাৎ দূরত্ব। আর উৎপল যক্ষ মূর্তিটিকে 'দিদি' বলে শুধু আপনই করলেন না, সেই দূরের নারীকে একেবারে কাছে টানতে চাইলেন, আমাদের সংসারের অভাব অনটনের শরিক হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। মোটকথা মধ্যবিত্ত পরিবারের এরকম টুকরো ছবি মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নানা টুকরো কথা যেখানে এক সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে কবি দেখেন—"গত মাসের মুদির হিসাবের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের ক্লাস -পরীক্ষার নম্বর বেমালুম মিশে গেল..." (৪৮ নং কবিতা : অগ্রন্থিত কবিতা) ছোট ছেলের ক্লাসের পরীক্ষার পূর্ণমান আর তাতে প্রাপ্ত নম্বরের ওজন নিশ্চয় বেশী হয় না। সেই ক্ষুদ্র সংখ্যার হিসাবের মতোই তাদের মুদিখানার দোকানের খাইখরচ হয়। এ থেকে তাদের আয় এবং ব্যায়ের বিষয়টিও আমরা কল্পনা করতে পারি, কল্পনা করতে পারি তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর হিসাব নিকাশ। আবার এই মধ্য পর্যায়ের সামাজিক জীবেরা যে অনেকটাই ভীরু, তারও কথা উৎপল জানিয়ে দেন—
"গত একুশে এপ্রিল রাতে কোথায় সে ছিল আমরা তো জানি
মন বোকা সেজে থাকে, যেন সাতে-পাঁচে নেই,
খুন-দেখা প্রতিবেশীদের মতো," (১৩ নং কবিতা : সলমা-জরির নাচ) - ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এরা বোকা সেজে থাকে, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা এদের নেই, প্রতিবাদ এরা করতে চায় না, কেননা এদের সংসারে মোটামুটি স্বচ্ছল ভাবে বাঁচার লড়াই প্রতিনিয়ত।

উৎপলের কবিতায় স্বতন্ত্রতার নানা দিক আমাদের চকিত করে। কবি জটিল কোন তত্ত্ব দর্শনের অবতারণা না করেই কত সহজে নিত্য নতুন চিন্তালতাকে কবিতা করে তোলেন। কত সহজে ঘরের আনাচে কানাচে পড়ে থাকা অব্যবহার্য বস্তুকেও কবিতায় হাজির করেন, তাদের মাঝেই রেখে দেন কবির চিন্তা। যেখানে ঘরের কোনে পড়ে থাকে ভাঙা চেয়ার, পুরনো জুতো, অব্যবহৃত হাঁড়ি-ডেকচি, পুরনো কাগজ সবকিছু কবির চোখে-মনে-কলমে উঠে আসে। কবি সেসবকে দেখে ভাবেন এসব এককালে ব্যবহৃত হত, কত মানুষের স্মৃতি তার সাথে জড়িয়ে আছে, তাদের মাঝেই কত পুরানো দিনের ফেলে আসা সময়ের চিহ্ন আছে। কবি সেসবকে অনুভব করেন, সেই পুরানো জিনিসকে তিনি নতুন চোখে দেখেন। পুরানো সেই

জিনিসপত্রকে কবি স্পর্শ করেন— উৎপলের মনে হয় তারা বহুদিন ঘুমিয়ে আছে, তাদের নিরুত্তর অবস্থান কবিকে কলম চালাতে বাধ্য করে—

"পুরনো জিনিসপত্র ছুঁয়ে দেখি। তারা আর কতকাল
ঘুমাবে বল তো? বহু যুগ কেটে গেল।...
পুরনো আসবাব আজও নিরুত্তর -ঐ আরামকেদারা,
ঐ নড়বড়ে বসার চেয়ার, অশ্রুসিক্ত পালঙ্ক ও খাওয়ার
টেবিল ; রান্নাঘরে বাসনগুলিও স্তব্ধ, ধোয়া মোছা, সামান্য
মলিন-যেন কতকাল কেউ খেতেও বসেনি।
ক'টি সাপ ঐখানে নির্ভয়ে খেলছে।" (১৫ নং কবিতা : অন্নদাতা যোসেফ) — এই অব্যবহৃত জিনিসপত্রের ও যেন মনের বেদনা আছে, প্রয়োজনহীনতায় তাদের অব্যবহার্য হয়ে পরে থাকার মাঝেই যেন এই প্রাণহীন বস্তুগুলির প্রতি কবির মমত্বও প্রকাশিত হয়েছে। হয়ত তাদের মনের গোপন ব্যাথা কবিকে মানবিক করে তুলেছে, পক্ষান্তরে জড়বস্তুর মাঝেই যেন প্রাণের বেদনা শুনেছেন কবি। বস্তুজগতকে সজীব চোখে, সজীব -প্রাণযুক্ত করে দেখার প্রয়াস, শুধু প্রয়াস নয় তাদের গোপন মনের কথাও যেন কবির বুকে বেজেছে- তাই কবির কলম তাদের কথা বলতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। (উৎপলকুমার বসু ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন বস্তু, যেমন চাবির রিং, কলম, আলপিন, পেরেক,ফুলদানি প্রভৃতি বস্তুকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতেন। তাদের রাখতেন যত্ন সহকারে, যেন হাত বাড়ালেই কাছে পাওয়া যায়। এই যত্ন, বিপরীতক্রমে হয়ত এই ভালোবাসাই এ কবিতার গর্ভগৃহ।) নড়বড়ে চেয়ার, পুরনো আসবাব যারা এককালে ব্যবহারের আয়োজনে আসত, বা বর্তমানের স্তব্ধ বাসনপত্র সেসবের নিরব পড়ে থাকাকে কবির মনে হয়েছে তারা বহু যুগ ঘুমিয়ে আছে। নির্জন কলঘর হয়েছে সাপের নির্ভয়ে খেলার স্থান। কবিতাটিতে একটা 'ঘুম', 'নিরুত্তর', বা নির্জনতার তন্ময়তাও কাজ করেছে। কবি যেন তন্ময় ভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন, কেননা কলঘর 'জনহীন', 'কতকাল কেউ খেতেও বসেনি'। নিরিবিলিই এই তন্ময়তার আশ্রয়, নিরব আসবাবপত্ররা কবির কল্পনার দোসর। পক্ষান্তরে, কবির কি এটাও মনে হয়েছে ব্যবহারের যোগ্যতা হারালে —'একে ফেলে দিতে হবে,', কেননা সুখ-দুঃখের সাথী কাব্যের ১২ নং কবিতায় তিনি বলছেন—

"খুলে দেখি ফেঁসে গেছে, ফেটে গেছে কাঁধের কিছুটা
এই জামা পরে আর বেরনো যাবে না, একে ফেলে দিতে হবে,
ভাঙা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়েই রাখছি তাহলে, বারান্দার এক কোণে।
পুরনো জুতোর সঙ্গে-ডাঁই অব্যবহৃত হাঁড়ি-ডেকচির মধ্যে
মঞ্জুরি বেড়ালটির ফেলে-যাওয়া আশ্রয় খুঁজে পাই,
ঝুড়ির মধ্যে থাকত,.."এখানেও সেই পুরনো জামা, ভাঙা চেয়ার, জুতো, হাঁড়ি ডেকচির কথাকে কবিতা করার প্রয়াস। সেসব ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র 'মঞ্জুরি' নামক এক বেড়ালের আশ্রয়স্থল। উৎপল বাস্তব জীবনে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র জোড়া লাগাতে পছন্দ করতেন, সেই সূত্রে কী ভাঙা ফাটা পুরনো জিনিসকে কবিতায় ঠাঁই দিচ্ছেন তিনি? ব্যক্তিগত জীবনের craftsmanship কি এর মূলে কাজ করেছে? অনুসন্ধানী পাঠক সেটাও একটু ভেবে দেখতে পারেন। আমরা তার কিছুটা হদিশ দিতে পারি মাত্র। আসলে উৎপলের মধ্যে যেমন এক অনন্য চিন্তার শিল্পীসত্তা বর্তমান, তেমনি এক ধরনের ক্রাফ্টেরও স্পর্শ লেগে থাকে। নানা রকম ফেলে দেওয়া, অব্যবহার্য জিনিসপত্র দিয়ে যেমন এক ধরনের ক্রাফ্ট তৈরী করা হয়, উৎপলের

কবিতাও যেন সেরকমই এক বিশেষ প্রকার ক্রাফ্ট। শব্দের উপাদানে যার অবয়ব রচিত হয় আর 'ছায়াপথ' কবিতায় পড়ে থাকে —

"ভাঙা চশমা, ছেঁড়া খাতা, দু-টুকরো পেনসিল
আর ফাটা শ্লেট, খড়িগুড়ো, উল্টানো দোয়াতের কালি।"

**তথ্যসূত্র:**


1. উৎপলকুমার বসু, *কবিতা সংগ্রহ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, অগ্রহায়ণ ১৪২২।
2. উৎপলকুমার বসু, *কবিতা সংগ্রহ ২,* দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।
3. উৎপলকুমার বসু, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, আগস্ট ২০০৭।
4. উৎপলকুমার বসু, *সারাৎসার ১,* ভাষালিপি, ২৪ রাজা লেন, কলকাতা ৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৭।
5. কমলকুমার মজুমদার, *উপন্যাস সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, জুন ২০১১।
6. গৌতম মণ্ডল( সম্পাদক), *উৎপলকুমার বসু সংখ্যা,* আদম, কৃষ্ণনগর নদীয়া ৭৪১১০১, একবিংশ বর্ষ বৈশাখ ১৪২৩।